28 November, 2012

সরকারি নীতির পিছনে কি অর্থনীতির তত্ত্ব কার্যকরী ?

(Millenial Asia তে প্রকাশিত ইংরাজী প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ)

কৌশিক বসু

(Senior Vice President and Chief Economist, The World Bank
and C. Marks Professor and Professor of Economics, Department of Economics,
Cornell University)

১. শাসন নীতি ও তত্ত্বজ্ঞান

অর্থনীতি তত্ত্ব ও আর্থিক কর্মপন্থার পরস্পর নির্ভরতা বিষয়ের উপরে রচিত এই প্রবন্ধটি কৃষি অর্থনীতি ও কর্মপন্থার কিংবদন্তী অধ্যাপক ধরম নারায়নের সম্মানজ্ঞাপক। আমি দিল্লী স্কুল অব ইকনমিক্সে যোগ দেবার আগেই তিনি দিল্লী স্কুল ও ইনস্টিটিউট অব ইকনমিক গ্রোথ ছেড়ে গেছেন। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কৃষি অর্থনীতির অতিথি অধ্যাপক হিসাবে এলেও সেখানে সময়ের দিক থেকে আমরা একসঙ্গে হতে পারিনি। আমি পি.এইচ.ডি. করে দেশে ফেরার তিন বছর পরে তিনি অকালে প্রয়াত হন। তাঁর খ্যাতির কথা আমি শুনেছি। তাঁর শান্ত রুচিসম্পন্ন মনোমুগ্ধকর ধরণ, অর্থনীতির বিশ্লেষণ ও প্রয়োগে নিবিষ্টতার কথা তাঁর প্রাক্তন সহকর্মীদের কাছে শুনেছি।

‘‘সরকারি নীতি প্রণয়নে অর্থনীতি তত্ত্ব থেকে কি কিছু নেওয়া হয়?’’ আপনারা এক কথায় এর উত্তর চাইলে বলব উত্তর পাবেন না। আপাতভাবে প্রশ্নটা ছোট হলেও যাকে বলে একটু আলঙ্কারিক । এই প্রশ্নটিকে নিয়ে আমি বিমূর্ত বা প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ অর্থনীতি তত্ত্ব আর নীতি প্রয়োগের বা রাজনীতির আপাতভাবে দুটি আলাদা জগতের সম্পর্ক আলোচনা করব। আশা করি আলোচনার শেষে, এই দুটি জগৎ পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসার বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ কেন এবং একটি জগৎ অন্যটির সম্বন্ধে সচেতন হলে ও যোগাযোগ রাখলে কীভাবে লাভবান হতে পারে সেকথা আপনাদের বোঝাতে পারব। এখন দুটি জগতের সঙ্গেই আমাকে পরিচিত হতে হয়েছে, খোলা মনে দু দিক থেকেই আমার অভিজ্ঞতা তুলে আনব।

আগে রাজনীতি ও প্রয়োগের সঙ্গে আমার যোগ খুব সামান্যই ছিল। বেশ কিছুদিন ধরে পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখার জন্য রাজনীতির জগতের ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখতে হয়েছিল। একটানা ১৯৯০ সাল থেকে অর্থাৎ মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধের সময়, ভারতবর্ষে বড় ধরনের আর্থিক সংস্কারের সময় থেকে এটা করছিলাম।

রাজনীতির সঙ্গে আমার আর একটা অনিচ্ছাকৃত যোগও ছিল। আমার মার বয়স তখন ৯১, কলকাতায় ছিলেন । মোটামুটি ভাল ছিলেন। ওঁর একমাত্র সমস্যা যেটা ছিল সেটা হল প্রায়শই ‘ইকনমিস্ট’ আর ‘কমিউনিস্ট’ শব্দ দুটি গুলিয়ে ফেলে আমি কত ভাল কমিউনিস্ট হয়েছি বলে ওঁর গর্বের কথা আমার বন্ধুদের কাছে বলতেন। একবার যখন আমি একটা আন্তর্জাতিক গবেষণা সম্মেলনে যাচ্ছিলাম তিনি সবাইকে ডেকে, পৃথিবীকে কীভাবে রক্ষা করা যাবে তাই নিয়ে, বড় বড় কমিউনিস্টদের সম্মেলনে আলোচনা করবার জন্য আমার যাবার কথা বলতেন। এই, আর ১৯৫০ আর ১৯৬০ এর গোড়াতে বাংলার রাজনীতিতে আমার বাবার ভূমিকার সামান্য স্মৃতি— এই হল রাজনীতির সঙ্গে আমার মোট যোগ ।

দেশে মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টার পদে আমন্ত্রিত হবার পরে একটা বড় পরিবর্তন ঘটল । অল্প কিছুদিন উৎকণ্ঠার পরে রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু সিদ্ধান্তটা সোজা ছিল না । গবেষণা একটা প্রতিযোগিতার খেলার মত। একই সঙ্গে এটা উত্তেজনায় ভরা আর সম্পূর্ণ মনোযোগ দাবী করে। একটা স্তরে এটা নিরাসক্ত কাজ— আপনি নতুন ভাবনা পেতে চাইছেন নতুন উপপাদ্য আবিষ্কার করতে চাইছেন । কিন্তু অন্য দিকে আবার এটা স্বার্থবোধে পরিপূর্ণ— কারণ একমাত্র আপনি ওই উপপাদ্যগুলি তৈরি করতে চাইছেন, আদর্শ হবে যদি আবিষ্কর্তা শুধু আপনি হন। আর প্রথম সারির গবেষণায় একজন হয়ে, পৃথিবীর সেরা মেধাদের সঙ্গে লড়ছেন । এটা একটা খেলা, একবার এর স্বাদ পেলে ছাড়া মুস্কিল।

সরকারে নিজের ধরন-ধারণ বদলাতে প্রথম কয়েক সপ্তাহ গেল । আর কিছু না হলেও ভাবলাম যেন নৃতত্ত্ববিদের মত আমি নর্থ ব্লকে পর্যবেক্ষণ করতে এসেছি। কোনোদিন এখানকার উপজাতিদের নিয়ে লিখব । কিন্তু একবার যেই এখানকার রাজনীতির আর পদ্ধতি-প্রকরণের বিশৃঙ্খলা আর ব্যস্ততার সঙ্গে, এখানকার ছন্দের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পেরেছি, তখন থেকেই আমি কাজটার মধ্যে মজা পেতে শুরু করেছি।

খানিকটা আমার সৌভাগ্যর জন্যই আমি কাজে আনন্দ পাবার সুযোগ পেয়েছি । যে তিন চার জন প্রবীণ রাজনীতির মানুষের সঙ্গে আমাকে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রেখে কাজ করতে হয়েছে তাঁরা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, দায়িত্বশীল চমৎকার মানুষ। যে কয়েক জন সচিব পর্যায়ের আধিকারিক এবং আমার কনিষ্ঠ পর্যায়ের উপদেষ্টার সঙ্গে আমার প্রতিদিনের ওঠাবসা তাঁরা প্রত্যেকেই দক্ষ ও উপযুক্ত রসবোধসম্পন্ন । অবশ্য আমার মত ভাগ্য সবার হয় না । আমার ব্যক্তিগত ভাগ্য ভাল হলেও ভুলে যাইনি যে রাজনীতি ঘোলাটে হতে পারে আর আমলাতন্ত্র মুখভার করে থাকতে পারে ।

আমার কাজটাকে উপভোগ করবার আর একটা কারণ আমার আস্থা বা বিশ্বাস যে ভারতবর্ষ এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক উত্থানের চূড়ান্ত পর্বে এসে পৌঁছেছে । এখনকার সুযোগগুলি সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে ভারতবর্ষ ২০৩০ সালের মধ্যে শিল্পোন্নত দেশগুলির সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে । এই রকম সম্ভাবনা গত ৬০ বছরের মধ্যে আসেনি । ভারতের দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল বলে *Economist* পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে— ("India's long term prospects now look stronger") — আমিও একই কথা বলি । আমার বিশ্বাস আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের বৃদ্ধির হার চীনকে ছাড়িয়ে যাবে ।

এই মন্তব্যর প্রেক্ষাপটটি বিবেচনা করা যাক । চীনের উল্কার গতিতে উত্থান গত তিরিশ বছরের অর্থনৈতিক ইতিহাসে একটা বড় জায়গা নিয়ে বসে আছে । একে প্রশংসা করতেই হবে । কিন্তু রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা উৎপাদনশীলতা বাড়ায় এবং উন্নতি ও অগ্রগতির সহায়ক হয় । বিচক্ষণ ও প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী সরকারের জন্য চীনে সাফল্য এসেছে । এই ধরনের নিয়ন্ত্রণের কোনো দাবি ভারত সরকার করতে পারে না । আর এটাই ভারতবর্ষের জোরের দিক । তাছাড়া ভারতের অনেকগুলি যৌথ মালিকানা সংস্থা এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি পরিণত এবং সামাজিক ভাবে অধিকতর দায়িত্বশীল হয়েছে । এটা আশাব্যঞ্জক, এই পরিবেশ আগে ছিল না ।

এতৎসত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত ফললাভের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। অর্থনৈতিক নীতিকে রূপদান করা এক জটিল কর্মকান্ড । অর্থনীতি এমন এক অদ্ভুত ধরনের যন্ত্র যেটিকে পুরোপুরি বোঝা গেছে এমনটি নয়। এটা এমন একটি গাড়ী যেটি চালানোর সময় অ্যাকসিলারেটারে চাপ দিলে গাড়ির গতি বাড়তেও পারে আবার একেবারে থেমেও যেতে পারে, ডান দিকে স্টিয়ারিং ঘোরালে গাড়ি ডান দিকে যেতে পারে আবার বাঁ দিকেও ঘুরতে পারে । এর জন্য সাহস, একেবারে নিজস্ব বোধ সর্বোপরি অ্যাডাম স্মিথের সময় থেকে এখন পর্যন্ত, খুব একটা নির্দিষ্ট প্রকৃতির না হলেও, যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান জমা হয়েছে সেই রকম সব কিছু প্রয়োগ করতে হয় । একজন রাজনীতিক এসব কিছু না জানতেই পারেন, সেটা দোষের নয় । কিন্তু একজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিক হতে হলে তাঁর পক্ষে এটা জানা জরুরি যে তিনি জানেন না । এই বোধ থাকলে পেশাদারি জ্ঞান প্রয়োগ করার মত ক্ষেত্র তৈরি হয় । সেক্ষেত্রে আমরাও সেরা বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের সমস্যা হল সবার ধারণা যে সবাই সব কিছু জানে । ইঞ্জিনীয়ারিং বা পদার্থবিদ্যায় এটা হবে না । মনে মনে এই পরীক্ষাটি করে দেখুন । ধরুন একটি অ্যারোপ্লেন বানানো হচ্ছে । আর এটির নক্সা তৈরীর সময় আমরা সবার মতামত নেবার সিদ্ধান্ত নিলাম । অধিকাংশ মানুষ চাইল বলে একটু ছোট ডানা; তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে সহায়ক বলাতে একটু উপর দিকে তোলা নাক । শেষ পর্যন্ত প্লেনটির উড়তে না পারার সম্ভাবনা আছে । আমাদের দেশে গৃহীত অন্তত কিছু অর্থনৈতিক প্রয়াস এইভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে । একটি গণতান্ত্রিক সমাজের লক্ষ্যে পৌছনোর ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত জনগণের পছন্দই চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করবে । তা হলেও বাস্তবে লক্ষ্যে পৌঁছনোর পদ্ধতির ব্যাপারে সম্ভাব্য সব থেকে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক ধারণা গ্রহণ করতে হবে ।

সরকারে কাজ করে বিশেষভাবে কী শিখলাম যখন কেউ জানতে চায়— এটা অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছে— তাদের জন্য আমার একটা পরিষ্কার উত্তর আছে । কায়েমী স্বার্থ অবশ্যই সঠিক নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে । কিন্তু তার থেকেও বড় বাধা হল সেই সব ভাবনা আর বিশ্বাস যা আমাদের অভ্যস্ত প্রথার মধ্যে বেঁধে রাখে। যুক্তিসিদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত নতুন চেতনাকে প্রতিহত করে নতুন অবরোহ যুক্তির দরজা আমাদের কাছে রুদ্ধ করে রাখে ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকের সমস্যাটা অনেকটাই ভিন্ন ধরনের । গণিত, পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি, জীবনবিজ্ঞান যে দিকেই তাকাবেন দেখবেন যে জ্ঞানের সীমা অতিক্রমী গবেষণার একটিই চালিকাশক্তি— সেটি হল নান্দনিক চেতনা । সতীশ গুজরাল যেটি বোঝানোর জন্য বলেছিলেন ‘সৃষ্টিশীলতার ব্যারাম’, এটি তাই। আপাতভাবে বিশৃঙ্খল জায়গাতে শৃঙ্খলা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা বিজ্ঞানীকে চালিত করে । গবেষকের এই রকমের গরজ থেকে যদি কোনো সামাজিক উপকার হয়ে থাকে তবে সেটাকে গবেষকের অভিপ্রায়হীন পরিণতি বলতে হবে । একটা উৎকৃষ্টতর পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য পিথাগোরাস সমকোণী ত্রিভূজের তিনটি বাহুর অন্তর্গত চমৎকার সম্পর্কটি আবিষ্কার করেননি । তাহলেও এটা স্বীকার করতে হবে যে ঐ সম্পর্কটি আবিষ্কার করা না হলে আজ আমরা অনেক দীনতর জগতে বাস করতাম । নিঃসন্দেহে তাহলে আজ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে আমরা বেশি সময় নিতাম এবং আমরা আরও কম খাদ্য ও নিম্ন মানের বাসস্থান পেতাম ।

ফলে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, গবেষকের সব গবেষণাকে সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের দিকে বাধ্যতামূলকভাবে চালিত করার নির্দেশ দিয়ে গবেষণার ক্ষতি করা ঠিক নয়। তাঁর সহাধ্যায়ীদের বিচারে যে দিক মূল্যবান সেই দিকে গবেষককে যেতে দেওয়া সঙ্গত। অর্থাৎ অনেক গবেষণা শেষ পর্যন্ত নান্দনিক গুণে সমৃদ্ধ হবে, কিন্তু সামাজিক গুণসম্পন্ন হবে সামান্য। প্রকৃতিগতভাবেই গবেষণা হল অপচয়ধর্মী কাজ। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে যেসব হাজার হাজার রচনা লেখা হচ্ছে আর স্বত্ব নথিভুক্ত করা হচ্ছে তার মধ্যে আমাদের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে এমন কিছু থাকবেই।

অনেক গবেষককে নিয়ে সমস্যা হল যে পরীক্ষাগারে আর ক্লাসঘরে অনেক বছর কাটানোর পরে তাঁরা ভুলে যান যে যা কিছু তাঁরা করেছেন সব কিছু প্রয়োগ করতে হবে এমন ভাবার দরকার নেই। এর মধ্যে অনেক কিছু মোটেই বাস্তবসম্মত নয় । এখানে সাধারণ বিবেচনার কথা এসে পড়ে । সাধারণ বিচার বিবেচনা দিয়ে বাস্তবে কী প্রাসঙ্গিক কোনটা অপ্রাসঙ্গিক বুঝতে পারি । দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হল এই সাধারণ বিচার বিবেচনা বেশ কিছু মৌলিক ক্ষেত্রে নিরত গবেষকের কাছে ততটা সাধারণ ব্যাপার নয় । এইজন্যই গবেষণার জগৎ আর বাস্তবে নীতি পদ্ধতি রচনার জগৎ মেলানো এত শক্ত ব্যাপার হয়ে আছে । একই সঙ্গে দুই দিকে সার্থক মানুষ যে এত কম দেখা যায় সেটা নিয়ে আশ্চর্য হবার কিছু নেই । এই কারণেই কেইনস ও রিকার্ডোর মত অর্থনীতিবিদ এত কম দেখা যায় ।

অর্থনীতির গবেষকের জন্য আর একটা সমস্যা আছে। এঁদের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণগুলিকেই উন্নয়নের মৌলিক কারণ বলে ভাববার একটা প্রবণতা থাকে। সমাজের উন্নয়ন ও দক্ষতার জন্য তিনি বলবেন সঠিক রাজস্ব নীতি চাই, টাকাকড়ির উপরে নিয়ন্ত্রণ চাই- রেপো (Repo), বিপরীত রেপো, সিআরআর (CRR) সঠিক হতে হবে, খরচ আর আয় বুঝে উদ্যোগ বাছতে হবে (Cost Benefit Analysis), ভবিষ্যতের পাওনার বর্তমান মান ও আইআরআর (IRR) কষে দেখতে হবে। এর মধ্যে খানিকটা ঠিক বলে মেনে নিলেও আমি নিঃসন্দেহ যে আর্থিক বিকাশ আর উন্নয়ন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণগুলির উপরে নির্ভর করে না। অনেকটাই নির্ভর করে প্রচলিত সামাজিক রীতি নীতি, সংস্কৃতি, নাগরিকদের দায়বদ্ধতা, সততা, বিশ্বাসযোগ্যতার মত গুণাবলীর উপর।

ভূমিকার অধ্যায়টির এখানেই বিরতি। এবার তাত্ত্বিক অর্থনীতির বিমূর্ত ভাষা আর আর্থিক নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেই ভাষার অপরিহার্যতার দিকে আলোচনাটি নিয়ে যাওয়া যেতে পারে । উদাহরণ হিসাবে তিনটি বিষয়কে অবলম্বন করে আলোচনাটি এগোবে । এগুলি হল যথাক্রমে মুদ্রস্ফীতি, শ্রম আইন এবং খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অর্থনীতি।

২. মুদ্রাস্ফীতি

সার্থকভাবে মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করতে হলে বিজ্ঞানের প্রথম নির্দেশ থেকে সূরু করতে হবে। সেটা হল নিজেদের অজ্ঞতা স্বীকার করে বলা যে আমাদের জানার থেকে অজানার পরিধি অনেক বড়। ঐতিহ্যগতভাবে এই ধরনের সংশয়ের শুরু করেছিলেন অ্যাবডেরার অ্যানাক্সেরাস ও এলিসের পাইরো নামক দুই গ্রীক দার্শনিক। তেমন কড়া স্বদেশী মেজাজের মানুষদের আশ্বস্ত করার জন্য বলছি যে যীশুখ্রীষ্টের থেকেও আনুমানিক শ তিনেক বছর আগে অ্যানাক্সেরাস ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ভারতীয় দার্শনিকদের অনুরূপ ধারণায় যে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এটা নিজের কথাতেই স্বীকার করে গেছেন।

আমরা যা কিছু দেখি সব কিছুই কেউ ইচ্ছা করে ঘটিয়েছে বলে ভেবে থাকি। এই জন্যই মুদ্রাস্ফীতির কথা নিয়ে এত বিবাদ। সরকার মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে থাকে বলে জনসাধারণ মনে করে। আমরা দেখেছি যে মুদ্রাস্ফীতি লেগে থাকার জন্য প্রতিবাদী মানুষ সরকারের নিন্দা করছে। অনেক সময় মুদ্রাস্ফীতিকে দুর্নীতির সমতুল্য বলেও ধরা হয় । দুর্নীতি লজ্জাজনক ব্যাপার। আমি মনে করি যে যারা সরকারে আছেন, আমার মত মানুষদের কথাও এখানে বলছি, তাদের খোলাখুলিভাবে দুর্নীতির সমালোচনা করা কর্তব্য। সরকার এমনকী জাতির প্রতি বিশ্বস্ততা আমাদের ব্যক্তিগত নৈতিকতার থেকে বড় হতে পারে না।

সরকারকে যেভাবে দুর্নীতির জন্য দায়ী করা হয় সেভাবে মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী করার কোনো মানে হয় না। চারটি কারণে এটা বলছি। প্রথমত মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলি পুরোপুরি বোঝার চেষ্টা করা হয় না । এটা আমাদের সরকার বা যে কোনো সরকারের উপরে কোনো মন্তব্য নয়। এটা তাত্ত্বিক অর্থনীতির অবস্থার উপরে মন্তব্য। আমরা মুদ্রাস্ফীতির অনেক দিক বুঝতে শিখেছি কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপারটার সব কিছু এখনও বুঝতে পারিনি। দ্বিতীয়ত সামান্য যেটুকু জেনেছি সেখানে একটা কথা খুব পরিষ্কার। শুধুমাত্র সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের — আমাদের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া— কাজকর্ম থেকে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় না। হাজার হাজার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও লক্ষ লক্ষ নাগরিকের কাজকর্মও এর পিছনে কাজ করে। তৃতীয়ত দুর্নীতিতে যারা লাভবান হয় তারা নিজেদের স্বার্থে দুর্নীতি টিঁকিয়ে রাখার চেষ্টা করে । কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির মত সমস্যা কোনো গণতান্ত্রিক সরকারই বয়ে বেড়াতে চায় না। চতুর্থত মুদ্রাস্ফীতি ঘটার কারণগুলি অর্থনীতিকদের কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট না হলেও মুদ্রাস্ফীতি কমানোর উপায়ের উপরে ভাল রকম দখল অর্জন করা গেছে । কিন্তু এই উপায়গুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি ঠেকাতে গেলে বেকারত্ব বেড়ে যেতে পারে। ফলে সমালোচকদের কথা শুনে বেপরোয়াভাবে মুদ্রাস্ফীতির উপায়গুলি প্রয়োগ করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে কিছু তথ্য আর কিছু সাধারণ নীতির কথা বলা যেতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি মাপার জন্য কোনো নির্বাচিত স্থানে নির্দিষ্ট দিনের বাজার দরের সঙ্গে এক বছর আগের বাজার দর তুলনা করা হয়। একবার মূল্য বৃদ্ধির ঘটনাকে সারা বছরের মূল্যবৃদ্ধি হিসাবে নথিভূক্ত করা হয়ে থাকে। যেহেতু বর্তমানের মূল্যের সঙ্গে ঠিক এক বছর আগের ওই দিনের মূল্যস্তর তুলনা করা হয় বছরের পরবর্তী সময়ে মূল্যস্তর স্থিতিশীল হলেও সূচকের কোনো পরিবর্তন করা হয় না।

খাদ্যদ্রব্যের বর্তমান মূল্য বৃদ্ধি এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। খাদ্যমূল্যের সূচক ২০০৯ এর জুন মাস থেকে বাড়তে বাড়তে ২৭ নভেম্বর সর্বোচ্চ হয়েছিল। তারপরে গড় সূচক বছরের বাকি অংশে স্থিতিশীল রাখা হয়েছিল । কিন্তু পূর্ব নির্দিষ্ট দিনে একবার সূচক নথিভুক্ত হলে ওই বছরের মধ্যে সেটির বদল করা হয় না । ফলে পুরো বছরটির জন্য একটি মুদ্রাস্ফীতির সূচক, ধরা যাক ১০ শতাংশ নথিভুক্ত হচ্ছে ।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ বিবিধ । আমরা সবাই জানি যে লোকেরা তাদের খানিকটা সঞ্চয় নগদ টাকাকড়িতে রাখেন। অর্থাৎ লকারে বা বালিশের তলায়। রাজেশ শুক্লা NCAER ও CMCR সংস্থা দুটির মারফৎ ২০১০ সালে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে গ্রামীণ সঞ্চয়ের ৪১

শতাংশ এইভাবে রাখা হয়েছে। এর একটা মজার দিক আছে। এই টাকাটা বাজারে না আসার ফলে সরকার অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতি না ঘটিয়ে ওই পরিমাণ টাকা বাজারে ছাড়ার সুযোগ পায়।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে সামান্য বেশি ঘাটতি বহন করা সম্ভব হয়। এর একটা কারণ হল উদীয়মান দেশগুলির সাধারণ নাগরিক খুব সম্ভব সঞ্চয়ের একটা অংশ নগদে ধরে রাখে এবং বাজারে ছাড়ে না। মুদ্রাস্ফীতি না ঘটিয়ে বিত্ত মন্ত্রক কতটা ঘাটতি বহন করতে পারে আর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কতটা অর্থ সৃজন করতে পারে তার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। এগুলি আমরা অভিজ্ঞতা থেকে শিখি। এই কারণেই আর্থিক নীতি আর রাজস্ব নীতি হল খানিকটা বিজ্ঞান আর খানিকটা অভিজ্ঞতাপ্রসূত আন্দাজ।

ধরে নেওয়া যাক, অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিখেছি যে রেপো হার ৬ শতাংশ, বিপরীত রেপো হার ৪.৭৫ শতাংশ এবং রাজস্ব ঘাটতি ৪ শতাংশ হলে মুদ্রাস্ফীতি হবে না। এখন ধরা যাক যে এই অবস্থায় সাধারণ নাগরিকের সঞ্চয় নগদে না রেখে ব্যাঙ্কে, পোস্ট অফিসে আর মিউচুয়াল ফান্ডে জমা করার আগ্রহ তৈরি হল। তখন হয়ত দেখা যাবে যে সরকার বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আচরণে কোনো রকমের বদল না ঘটে থাকলেও মুদ্রাস্ফীতি মাথাচাড়া দিচ্ছে। এই রকম একটা মুদ্রাস্ফীতি কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের একটুখানি করে বেশি টাকা বাজারে আনার ফলে ঘটল। এটা ঠিক যে রাজস্ব ঘাটতি কমিয়ে আর নগদের যোগান কমিয়ে এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু এখানে সংশোধনের কোনো সঠিক বিজ্ঞান জানা না থাকায় ভুল করার সম্ভাবনা নিয়েই বাস্তবে এগোতে হবে।

এটা একটা উদাহরণ মাত্র। আরও অনেকভাবে ব্যক্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজ থেকে মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হতে পারে। রাষ্ট্র প্রতিবিধান করতে পারে এটা সত্য। কিন্তু এখনই যেমন বলা হল, এর জন্য কোনো চটজলদি পদ্ধতি নেই। একটা আকস্মিক মুদ্রা হ্রাস যেমন মুদ্রাস্ফীতি থামাতে পারে তেমনই খুব সম্ভব বেকারত্ব বাড়িয়ে উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটিয়ে অর্থনীতির গতিও স্তব্ধ করে দিতে পারে। এই রকম কিছু ঘটাতে না চাইলে সাবধানে এগোতে হবে।

সরকারের দুর্নীতিতে আমি লজ্জিত হলেও বর্তমান সমস্যাপুর্ণ সময়ে সরকারের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা নিয়ে লজ্জিত হবার মত কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। বস্তুত আমি মনে করি যে সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যথেষ্ট ভালভাবে সমস্যার মোকাবিলা করছে। আমাদের খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে গুরুতর ভুলভ্রান্তি আছে। এই বিষয়ে আমি আগে লিখেছি (Basu, 2010), এখানেও পরে কিছু মন্তব্য যোগ করব। আরও বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য আর গরীব মানুষের কাছে খাদ্যশস্য পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করার জন্য নীতির সংশোধন জরুরি। কিন্তু বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

৩. শ্রম

অন্যের ভাবনার যৌক্তিকতাকে বুঝতে না পেরে আমরা যে ভুল করি সেই প্রসঙ্গে দুটি বিষয় নিয়ে এবার আলোচনা করব। কর্মসংস্থানের বাজার ভালভাবে চলতে পারে ও কর্মীরা ভালভাবে নিজেদের কাজ করতে পারে এই রকম সদুদ্দেশ্য নিয়ে শ্রম আইন রচনা করা হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে দারিদ্র্যর যে স্তরে মানুষেরা আছে ও যে রকম অত্যন্ত কম মজুরীতে অধিকাংশ শ্রমিক কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে সে দিকে তাকিয়ে স্বীকার করতেই হবে যে শ্রমনীতি বিশেষ সার্থক হয়নি।

আমাদের খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণের নীতি নিয়েও অনুরূপ সমালোচনা করা যেতে পারে । খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য প্রায় পাঁচ লক্ষ রেশন দোকান নিয়ে একটা বিশাল ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা দরিদ্রতম পরিবারের মানুষও যাতে ন্যূনতম পরিমাণ খাদ্য পায় এটা সুনিশ্চিত করতে চেয়েছি । কিন্তু এত কাণ্ডের পরেও ব্যাপক হারে অপুষ্টি রয়েছে আর গরীবদের জন্য খাদ্য প্রায়শঃই তাদের কাছে পৌছচ্ছে না । কোনো কোনো হিসাবে দরিদ্রদের জন্য ধার্য গমের দুই-তৃতীয়াংশ তাদের কাছে পৌঁছয় না (Khera, 2010)। তাছাড়া আমাদের সংরক্ষণের সামর্থ্যর থেকেও বেশি খাদ্যশস্য সংগ্রহ করবার ফলে কিছুটা পচে যায় ও কিছুটা ইঁদুরে খেয়ে নষ্ট করে ।

এখানে নীতি বা কর্মপন্থাগুলি এত ব্যর্থ হল কেন? সাধারণের উত্তর হল "কায়েমী স্বার্থ" । অবশ্য আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি যে কিছু মানুষ অব্যবস্থা থেকে মুনাফা লোটার মতলব করলেও আমাদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ আমাদের ভাবনা চিন্তার দীনতার মধ্যে নিহিত আছে । আমরা পদ্ধতি নির্ধারণের সময় উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যানগত তথ্যের উপরে নির্ভর না করে রাজনৈতিক মতৈক্যর উপরে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি বলে পরিণাম এত শোচনীয় হয়েছে । ঠিক যেমন সংখ্যাগুরুর মত নিয়ে বা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কথা ভেবে একটি অ্যারোপ্লেন বানালে সেটি উড়বে না ঠিক তেমনি আমাদের উদ্যোগও প্রায়শঃই মুখ থুবড়ে পড়েছে।

একটি ভাল পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য উপযোগী যা কিছু তথ্য ও জ্ঞান বর্তমান সেগুলির সাহায্য নিতে হবে। আসলে অন্যদের ভাবনার যৌক্তিকতাকে মূল্য দেবার কথা ভাবতে হবে। একটি সুপরিকল্পিত পদ্ধতির সাথে ব্যক্তির উৎসাহ-পছন্দ সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এটা হল আধুনিক Game Theory-র মৌলিক শর্ত। কীভাবে ধরব স্থির করার জন্য শুধু বিচক্ষণতাই যথেষ্ট নয়। সাধারণ মানুষ, রেশনের দোকানের মালিক এবং এমনকী যে সব প্রশাসকরা আইন প্রয়োগ করবেন তাদের সবার বিচার বুদ্ধির কথাও ভাবতে হবে।

আমরা আমাদের ভাবনায় পুলিসের লোক, রেশনের দোকানদার, শ্রমিক, শ্রমিক সংগঠনের নেতা ইত্যাদি মানুষগুলির বিচক্ষণতার কথা উপেক্ষা করে থাকি। এটা আমাদের একটা মস্ত বড় ভুল। মানুষগুলিকে যন্ত্র বলে ভাবলে, মানুষগুলি শুধুমাত্র সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে নিজের কর্তব্য করে যাবে ভাবলে, নীতি প্রয়োগ করে ফল পাওয়া যাবে না। এটাই হল Game Theory -র তর্কের সার কথা।

এখানে একটা সাবধানতার কথা বলি। আমি মানুষের বিচক্ষণতার উপরে জোর দিচ্ছি বলে এমন কথা বলছি না যে মানুষরা সব স্বার্থপর। মানুষদের মধ্যে কম-বেশি নৈতিকতা, ন্যয়পরায়ণতা নিয়ম নিষ্ঠা জাতীয় গুণগুলি বিরাজ করে। এই ধরণের নৈতিক সীমার মধ্যে

থেকে মানুষ স্বার্থসিদ্ধির কথা ভাবে (Basu, 2010a)। সেইজন্য আমি বলব যে বাস্তবে রেশনের দোকানের মালিক কতটা সৎ হতে পারে, পুলিসের লোক কতটা সৎ হতে পারে মাথায় রেখে নীতি তৈরি করা দরকার। এঁদের যন্ত্রের মত সঠিক ভেবে কোনো ব্যবস্থা প্রণয়ন করলে ব্যবস্থাকে ব্যর্থতার পরিণতির দিকে এগিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রমের বাজারের উপরে নিয়ন্ত্রণের কথা ভারতবর্ষে যেন একটা নিষিদ্ধ ব্যাপার। সেই কারণেই এই বিষয় নিয়ে আমি কিছু বলব বলে ভেবেছি। শ্রম সংক্রান্ত আইনের সংস্কার নিয়ে কেউ কথা বললে তাঁকে নব্য উদারপন্থার প্রবক্তা বলে ধরে নেওয়া হয়। আর যাঁরা শ্রমের বাজারের সংস্কারের বিরোধী তাঁদের প্রগতিশীল ও শ্রমিকের পক্ষপাতী বলে ভাবা হয় । আমি বলতে চাই যে ওই ধরনের ভাবনা মূলত ভ্রান্ত। আমরা শ্রম আইনের সংস্কার ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত বা দেশের দ্রুত অগ্রগতির কথা ভেবে চাইছি না, শ্রমিক আরো ভালোভাবে তার কাজ করতে পারবে ভেবে চাইছি। সদিচ্ছাপ্রণোদিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের আইন সংগঠিত ও অসংগঠিত, উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিকের স্বার্থহানি করেছে।

এই বিষয়টিকে অন্তত বন্ধ জায়গা থেকে বাইরে সবার আলোচনার ক্ষেত্রে বের করে আনা দরকার। আমার মনে হয় সম্পর্কিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে বুঝতে পারলে শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলি নিজেরাই সংস্কারের প্রয়োজনের উপরে জোর দেবে। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়কে মতাদর্শ তাড়িত ব্যক্তিদের কুক্ষিগত হতে দেওয়া উচিত হবে না।

কিছু কিছু তর্কে এক জন কোন পক্ষের হয়ে কথা বলছে দেখে তাঁর মতাদর্শ ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু এমন অনেক তর্কও আছে যেখানে এ কথা বলা চলে না। বহির্বিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব নিয়ে দুজনের তর্কে কোনো একজন কোন পক্ষ নিচ্ছেন শুনে তিনি বামপন্থী না দক্ষিণপন্থী স্থির করতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। আমি বলার চেষ্টা করছি যে শ্রমের বাজারের সংস্কারের কথায় পক্ষপাত বহির্বিশ্বের প্রাণীর অস্তিত্ব নিয়ে তর্কের মত হয়ে যাবে। এর থেকে কারোর মতাদর্শ ধরা পড়ে না। একজন বামপন্থী হয়েও শ্রমিকের নিয়োগের কার্যকাল বাইরের থেকে নির্ধারিত হওয়া উচিত নয় বলে তর্ক তুলতে পারে । নানা অর্থনৈতিক অংশভাগীর প্রতিক্রিয়া দেখেও বর্তমানে বামপন্থী মত হল যে ওই রকম আইন হলে আখেরে শ্রমিকের অবস্থা খারাপ হবে।

ভারতের *Industrial Disputes Act, 1947* -এর মত আইন আমার কাছে এখানে প্রধান আগ্রহের বিষয়। বড় সংস্থা থেকে ছাঁটাই ও বরখাস্তর উপরে, ১৯৭৬ ও ১৯৮৪ র সংশোধন সহ এই আইনে, বিধিনিষেধ রাখা হয়েছে। এখানে ভাববার বিষয় হল যে বিধিনিষেধগুলি মালিক ও শ্রমিকের চুক্তির অন্তর্ভূক্ত নয়, বাইরের থেকে এই ধরণের চুক্তি বাতিল করে দিতে পারে। যে সব প্রতিষ্ঠানে ১০০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করে সেখানে ছাঁটাই ও বরখাস্ত করার আগে বা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করবার আগে মালিকের পক্ষে সরকারের অনুমতি বাধ্যতামূলক।

শ্রম আইন থেকে যতটা মনে হয় বাস্তবে শ্রমের বাজারে সরকারের অনুপ্রবেশ তার থেকেও অনেক বেশি। ১৯৪৭-এর শিল্প বিরোধ আইন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে শুধু শ্রমিকদের বাস্তব বিরোধ নয় সম্ভাব্য বিরোধেও মধ্যস্থতার অধিকার দেয়। তদুপরি আছে রাজনৈতিক ও মন্ত্রী স্তরের হস্তক্ষেপের সমস্যা।কখনো কখনো বিচারালয়ও শ্রমিকের অভিভাবকসুলভ আচরণ করে। কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের জজ জাস্টিস হাজারি ১৯৯২ সালের এক দেউলিয়া ব্যবসার প্রসঙ্গে রায় দিলেন যে অন্য কোনো অধিগ্রহণকারি ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠান যে দেউলিয়া হবে না আর শ্রমিক ছাঁটাই করবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অতএব তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অধিগ্রহণ করে বর্তমান কর্মচারিদের নিয়ে সংস্থাটি চালাতে নির্দেশ দিলেন । অনেক সময়েই একটি আইনের প্রতিক্রিয়া বিধির ভাষাকেও অতিক্রম করে যায় । আইন বিষয়ক দার্শনিকরা 'ব্যক্ত বিধির ক্রিয়া কলাপ' নিয়ে লিখেছেন। এখানে আইনের ভাষার উপরেও মানুষের পছন্দ ও আচরণ আইনের প্রভাবকে কীভাবে পরিবর্তিত করে তার কথা বলা হয়েছে। এই ধরনের আইন ও বিধান যারা আইনের অন্তর্ভুক্ত নয় (দৃষ্টান্তস্বরূপ, ছোট প্রতিষ্ঠানের কর্মী) শুধুমাত্র তাদের স্বার্থহানি করে এমন নয়, যারা আইনের দ্বারা সুরক্ষিত তাদেরও ক্ষতি করে । অনেক আলোচকের মনে হয়েছে যে নিরাপত্তামূলক শ্রম বিধি দেশের বিকাশ ও দক্ষতার হানি করেছে (see, eg., Ahluwalia, 1991; Papola, 1994; Besley and Burgess, 2004)। তারা হয়ত যথার্থ, কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে ওই ধরনের বিধি যাদের উদ্দেশ্যে রচিত, অর্থাৎ শ্রমিক, তাদেরই ক্ষতি করছে।

ধরা যাক কোনো বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা মালিকের কাছে মজুরী বাড়িয়ে দিতে বলছে, এবং মালিক কখনো বরখাস্ত করলে ক্ষতিপূরণ ছাড়াই কাজ ছেড়ে দেবার কথা দিচ্ছে। শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষ এই রকম চুক্তিতে উপকৃত হলেও বর্তমান ভারতবর্ষে মালিক এই রকম চুক্তিতে রাজী হবে বলে মনে হয় না। কারণ আগে শ্রমিক- মালিকের মধ্যে চুক্তি যাই হয়ে থাক, কিছুদিন বেশী মজুরী দেবার পরে (হয়ত উৎপাদনের চাহিদা বাজারে কমে গেছে বলে) মালিক বরখাস্তের কাগজ ধরিয়ে দিলে, কর্মচারীরা সরকারের কাছে আবেদন করবে আর সরকার শ্রমিক বিরোধ আইন দেখিয়ে বরখাস্তর কাগজ বেআইনি ঘোষণা করবে। বস্তুত শ্রমিকদের বরখাস্ত না হবার *অধিকার* ছেড়ে দেবার মত বিশ্বাসযোগ্য পথ বেশি নেই। এখানে আমাদের 'বরখাস্তে বাধা না দেওয়া' ও 'বরখাস্ত না হবার অধিকার ছেড়ে দেওয়ার' মধ্যে প্রভেদ করা প্রয়োজন। একটি কর্মচারি বরখাস্তে বাধা না দেওয়ার কথা ভাবতে পারে; কিন্তু মজার ব্যাপার হল সে *অধিকার* পরিত্যাগ না করতেও পারে, আর ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বরখাস্ত না হবার অধিকার পরিত্যাগ করতেই পারবে না ।

আমার বক্তব্যর দৃষ্টান্ত দেবার জন্য ওখান থেকে সরে এসে ধারণা তৈরি করা যাক (Basu, 2006)। রাঁধুনি, ড্রাইভার ইত্যাদি জাতীয় বাড়ির কাজের লোকেদের বাজারের কথা ভাবা যাক। ধরুন সরকার নতুন আইন করল যার ফলে কেউ বাড়ীর কাজের লোকেদের ছাড়াতে পারবে না, অথবা ধরুন ছাড়াতে হলে জটিল সরকারি অনুমতি নিতে হবে। প্রথম দৃষ্টিতে, বাড়ির কাজের লোকেদের প্রতি আমাদের আচরণের ধরনের কথা ভেবে, এটা প্রগতিশীল বিধান বলে মনে হবে। কিন্তু এই ধরনের আইনের ফল কী হবে বোঝা শক্ত নয়। লোকেরা অবিলম্বে বাড়ির কাজের লোক রাখা কমিয়ে দেবে । কাপড় কাচার যন্ত্র, শুকোবার যন্ত্র, মাইক্রোওয়েভ উনুন, ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের চাহিদা বেড়ে যাবে। এই

রকম আপাতভাবে ভালো নীতির ফলে সব থেকে বেশি ক্ষতি হবে কাজের লোকেদের। এদের চাহিদা কমে যাওয়ার ফলে বেকারের সংখ্যা বাড়বে, মজুরী কমে যাবে।

আমি বলতে চাই যে আমাদের শিল্প ক্ষেত্রের শ্রমিকদের বেলাতে এটাই ঘটেছে। আমি আইন বদলানোর কথা বলছি না, আরও অল্প কিছু করতে বলছি, জনসাধারণের মধ্যে এই আলোচনা নিয়ে আসতে বলছি। আমার আশা একবার বিষয়টা ঠিকমত বুঝতে পারলে, যৌথ মালিকানা সংস্থা বা খবরের কাগজের প্রতিবেদক নয়, শ্রমিকদের ভিতর থেকেই পরিবর্তনের দাবি উঠবে।

৪. খাদ্যশস্যর বাজার

খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে ভারত সরকারকে সংবাদ মাধ্যমের অনেক বিরূপ সমালোচনার মধ্যে পড়তে হয়েছে। সমালোচকরা বলেছেন যে খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধির সাথে সাথে মজুত খাদ্যদ্রব্যর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এবং নষ্ট হচ্ছে। আরও বলা হচ্ছে, গরীবদের উদ্দেশ্যে ভর্তুকি-যুক্ত খাদ্যশস্য তাদের কাছে পৌঁছয় না আর যখন পৌঁছয় তখন প্রায়শঃ ভেজাল মেশানো থাকে।

এগুলি কঠিন মন্তব্য। সরকারের অত্যন্ত সদিচ্ছা সত্ত্বেও এটা ঘটেই চলেছে। এর থেকে মনে হয় সমস্যার ভিতরে সাধারণভাবে স্বীকৃত ব্যাপারগুলির থেকে আরও বেশী কিছু আছে। কতকগুলি জনপ্রিয় প্রস্তাবের মধ্যে ঝুঁকির ব্যাপার আছে। খাদ্যশস্য পচে যাওয়া ও নষ্ট হবার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আরো কতকগুলি গুদাম করার পরামর্শর কথাটা ধরা যাক। এমনিতে এটা প্রার্থিত তো বটেই। কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে এর ফলে খাদ্যের দাম কমবে না। কারণ শুধু মজুত করলেই খাদ্যশস্যর অভাব দূর হবে না।

বাজারে হস্তক্ষেপের জন্য আর একটা বহু আলোচিত নীতিগত পরামর্শর কথা ভাবুন। সেটা হল সরকারের মজুত খাদ্যশস্য বিনা পয়সায় বা খুব কম দামে বিক্রী করা উচিত। পাশাপাশি অন্য কিছু নীতির পরিবর্তন না করে এটা করলে আমাদের আর একটা সমস্যায় পড়তে হবে । ব্যবসায়ীরা বিনা পয়সায় বা কম দামে এই সব শস্য কিনে ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার কাছে ন্যূনতম সংরক্ষণ মূল্যে আবার বিক্রী করবে । তার মানে গোল হয়ে ঘুরতে থাকবে। বারে বারে একই খাদ্যশস্য সরকারের কাছ থেকে কিনে আবার সরকারের কাছেই বিক্রী করা হবে । মাঝের থেকে ব্যবসায়ীরা বিশাল লাভ করবে।

কারোর এখানে প্রতিক্রিয়া হতে পারে যে ব্যবসায়ীদের এই রকম লাভ করা অনৈতিক, তাদের এই রকম করা উচিত নয়। এখানে আমরা কী 'উচিত' আর কী 'হয়' গুলিয়ে ফেলছি। কার্যকরী নীতি তৈরির সময় হিসেবী ব্যবসায়ী বাস্তবে কী করে ভাবতে হবে। তাদের সরকারের নির্দেশ পালনের জন্য নীতিবাগীশ যন্ত্রবিশেষ ভেবে আমাদের বসে থাকলে চলবে না । এখানে ব্যবসায়ীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অফিসার ও পুলিস নিয়োগ করা উচিত বলে অনেকে আমাদের বলতে পারেন। এই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিস ও প্রশাসকরা খুব সম্ভব প্রশাসন ও দুর্নীতির আর একটা স্তর তৈরি করবে। তারা এটা করবে না বলা মানসিকতার দিক থেকে সুন্দর মনে হলেও বাস্তবসম্মত কথা নয়।

আমরা অর্থনৈতিক তত্ত্ব থেকে শিখেছি যে ভাল অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করবার সময়, যাদের কথা ভেবে এটা করা হচ্ছে, তাদের আগ্রহের ও প্রবণতার দিক বিবেচনা করা প্রয়োজন। তাদের মধ্যে ঠকাবার প্রবণতা থাকলে নীতি নির্ধারণের সময় সেটা ভেবে রাখা উচিত। উপরন্তু উৎপাদন এবং সংগ্রহ থেকে শুরু করে মজুতের বাইরে এনে বিতরণ করা পর্যন্ত সমস্ত খাদ্যশস্য নীতির ব্যাপারটাকে সামগ্রিকভাবে দেখা দরকার। অন্য সব কিছু যেমন আছে তেমন রেখে দিয়ে, শুধু একটা অংশ মেরামতের চেষ্টা করলে উপকারের থেকে বেশি অপকার করা হবে।

এক বছর থেকে পরের বছর পর্যন্ত প্রায় সমান হারে খাদ্যশস্য সংগ্রহের প্রবণতা, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যর ব্যাপারে একটা বিভ্রান্তিকর ব্যাপার হয়ে আছে। প্রকৃত অর্থনীতির তত্ত্ব, বাজার স্থিতিশীল করবার জন্য, উৎপাদন যখন প্রচুর ও দাম কম তখন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে আর উৎপাদনে ঘাটতি ও দাম বেশি তখন বাজারে খাদ্য ছাড়তে বলবে। এটা হলে ব্যবসায়ীদের বাজার থেকে কিনে সরকারের কাছে বিক্রী করবার সম্ভাবনা কম হবে। এক বছর থেকে পরের বছরে খাদ্যশস্যের দামও স্থিতিশীল হবে। এই রকম হলে, অর্থনীতির প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য বইতে যে অতি পরিচিত মাকড়সার জাল তৈরির পদ্ধতিতে দাম ওঠা নামা করতে করতে বাজার অস্থির হবার কথা শেখানো হয়, তার সম্ভাবনাও কমে যাবে। সম্প্রতি একটি লেখাতে দেশের খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনার সামগ্রিকভাবে সংস্কারের জন্য আমি এক গুচ্ছ নীতি নিয়ে বিস্তারিতভাবে বলেছি (Basu, 2010)।

এবার খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনার আর একটি সমস্যার কথা বলছি। দরিদ্র ও বিপন্ন মানুষদের কম দামে খাদ্যশস্য দেবার একটা রীতি ভারতবর্ষে অনেক দিন ধরে প্রচলিত আছে। যে কোনো দায়িত্বশীল দেশে এই রকমই হবার কথা। প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষদের প্রতি ধনী ও মধ্যবিত্তের একটা দায়িত্ব আছে। এই দিক থেকে খাদ্য সুরক্ষা বিল এর সাহায্যে উদ্যোগকে আরও সামগ্রিক করবার সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু আমরা যে সার্থকভাবে এটা করতে পারব সেই ব্যাপারে সুনিশ্চিত হবার জন্য খাদ্য দরিদ্রের কাছে পৌঁছে দেবার পদ্ধতি পুনর্বিবেচনার দরকার আছে। এইজন্য বর্তমান বন্দোবস্ত কেন খারাপ করল, এই প্রশ্ন থেকে আমাদের শুরু করতে হবে।

বর্তমানে দেখুন ভারতের খাদ্য নিগম ভর্তুকিজাত খাদ্য রেশনের দোকানে দেয় আর রেশনের দোকানদারদের বাজারের দামের থেকে কম দামে গরীব গৃহস্থদের দিতে বলা হয়। রেশনের দোকানদারেরা পুরোপুরি সৎ বা আজ্ঞাবাহী যন্ত্র হলে ব্যবস্থাটায় গলদ থাকত না। কিন্তু এর কোনোটাই তো নয়। প্রলোভনটা এই সব দোকানদারদের পক্ষে এতই বড় যে এদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের সামলাতে পারে না। তারা সরকারের থেকে ভর্তুকিজাত খাদ্য নিয়ে খোলা বাজারের চড়া দামে অনেকটাই বিক্রী করে দেয়। তারপরে হয় শস্য সরকার দেয়নি বলে গরীবদের বিদায় করে দেয় নয়তো শস্যে ভেজাল মিশিয়ে গরীবদের কাছে বিক্রী করে। বিপণনের পুরো ব্যবস্থাটার ভিতরে এই ফাটলটা চিনতে পারলে গরীবদের সরাসরি ভর্তুকি দেবার প্রয়োজনটা বোঝা যায়।

এর একটা পদ্ধতি হল ভর্তুকি রেশনের দোকানদারকে না দিয়ে সোজাসুজি গরীবের হাতে দেওয়া। খাদ্যর জন্য কুপন বা তার থেকে ভাল হতে পারে স্মার্ট কার্ড বা এমনকী মোবাইল ফোনের সাহায্যে পৌঁছে দেবার খবর দিয়ে এটা করা যেতে পারে। সরকারের থেকে যে ভর্তুকি পেয়েছে সেটা দিয়ে গৃহস্থ স্বাধীনভাবে যে কোনো দোকান থেকে খাদ্যদ্রব্য কিনতে পারবে। দেখুন এখন সবাই এক দাম দিচ্ছে বলে দোকানদারের গরীব খদ্দেরের থেকে বড়লোক খদ্দেরকে বেশি খাতির করবার কোনো কারণ থাকছে না। তাছাড়া এখন খাদ্যে ভেজাল মেশালে দোকানদারকে খদ্দের হারানোর ঝুঁকির কথা ভাবতে হবে। এটা পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত ব্যবস্থা নয় কিন্তু নিঃসন্দেহে বর্তমান ব্যবস্থার থেকে ভাল। বর্তমান ব্যবস্থার কিছু ত্রুটি এখানেও থাকবে কিন্তু আর কোনো বড় রকমের ত্রুটি থাকবে না।

লোকেরা জাল কুপন নিয়ে আসতে পারে বলে ভাবা হচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে চিন্তার বিষয়; কিন্তু প্রতিদিনের টাকা পয়সা লেনদেনে জাল টাকার নোটের সমস্যার থেকে গুরুতর সমস্যা নয়। ঠিক যেমন টাকা জাল হচ্ছে বলে আমরা নগদ টাকার ব্যবহার বন্ধ করিনি, আলোচ্য ঝুঁকিও আমাদের কুপন ব্যবহার বন্ধ করার কারণ হবে না। বর্তমানে যে প্রক্রিয়ায় টাঁকশালে টাকা ছাপানো হচ্ছে একই প্রক্রিয়ায় আমাদের কুপন তৈরি করতে হবে । এর মধ্যে যথেষ্ট সাবধানতা আছে।

এই কুপনের বা স্মার্ট কার্ডের বিনিময়ে বাড়ির কর্তা অন্য কিছু কিনবে এই রকম সামান্য ঝুঁকি এখানেও আছে। অবশ্য বাড়ির প্রবীণতম মহিলাকে কুপন বা স্মার্ট কার্ডগুলি দিয়ে এই সমস্যা অনেকটাই ঠেকাতে পারা যাবে। এইভাবে সংসারের ব্যয়ে যে বিশাল গুণগত প্রভেদ ঘটে থাকে তার স্বপক্ষে অনেক সমীক্ষার নজির আছে (Sen, 1990; Desai and Jain, 1994; Agarwal, 1997; Basu, 2006).।

৫. সামাজিক আদর্শ ও ব্যক্তিগত ন্যায়পরায়ণতা: সমাপ্তিসূচক মন্তব্য

এই প্রবন্ধে মানুষের আচরণের নিন্দনীয় দিক তুলে ধরা হয়েছে আর এটা মনে রেখে নীতি নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে। সাধারণত অর্থনীতিবিদরা এখানেই বিষয়টিকে ছেড়ে দেন কিন্তু সেটা দুর্ভাগ্যজনক। একটি সার্থক অর্থনীতি যে শুধুমাত্র ভাল আর্থিক নীতির উপরে নির্ভর করে না নাগরিকদের শুভবুদ্ধির উপরেও নির্ভর করে তার অনেক নজির আছে। যথার্থ মানসম্পন্ন অর্থনীতির বইতে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততার যথেষ্ট উল্লেখ দেখা যায় না কিন্তু ক্রমশ বিকাশশীল গবেষণাতে ধরা পড়ছে যে এই গুণগুলি যেসব সমাজে আছে তারা অর্থনৈতিক দিকেও ভাল ফল পাচ্ছে। কোনো মানব সম্প্রদায়ের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের মধ্যে এই সব গুণের অস্তিত্বর সম্পর্ক নির্ধারণ সহজ কাজ নয়। এটা সর্বদা একমুখীও নয়। আমি এই বিষয়ে স্থানান্তরে বিষদ আলোচনা করেছি (Basu 2010a)। জটিলতা থাক বা না থাক, সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ককে পরিণত করে আমরা একটি অর্থনীতিকে আরও দক্ষতাসম্পন্ন করতে পারি ও আরও দ্রুত উন্নয়ন ঘটাতে পারি।

অতি সরলভাবে দেখলে যুক্তিটা নিম্নরূপ। একটি অর্থনীতির ভালভাবে চলার জন্য ও দ্রুত বিকাশের জন্য চুক্তির উপরে নির্ভরতা আবশ্যক । (“তোমাকে আজ আমি তেলের যোগান দেব তুমি আমাকে কাল দাম দেবে”। “তোমাকে বাড়ি কেনার জন্য ধার দেব, তুমি আগামী ৩০ বছরে সুদ সহ ধার শোধ দেবে।”) কিন্তু আবার চুক্তি করা, কথা দেওয়া এগুলি জীবনে সর্বত্র হয়ে থাকলেও সরকার বা বিচারালয়ের পক্ষে কারোকে বাধ্য করার একটা সীমা আছে। মানুষদের মধ্যে নিজস্ব সততা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা থাকলে অনেক ছোট ছোট কথা দেওয়াতে ব্যয়সাপেক্ষ আনুষ্ঠানিক চুক্তি না করলেও চলে। এইজন্য নাগরিকদের মধ্যে এই সব গুণ আত্মস্থ করতে পারলে সমাজ ভালভাবে চলতে পারে।

উন্নয়নের এই সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পূর্বশর্তগুলির দিকে অর্থনীতি চর্চার মূল ধারাতে খুব কম মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। আমাদের গবেষণার জগতে এখানে সংশোধন করা দরকার; এবং একই সঙ্গে শিক্ষার মাধ্যমে নেতাদের আরও ভাল দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এই মূল্যবোধগুলি জনগণের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু সে সব বারান্তরে বলার গল্প।

এটা খুব বড় বিষয়— এর উপরে অনেক লেখার আছে কিন্তু সংক্ষেপে হলেও কিছু না বলে ছেড়ে গেলে আমি খুব ভুল করব।

References

Agarwal, B. (1997), '"Bargaining" and Gender Relations: Within and Beyond the Household', *Feminist Economics*, 3(1): 1–51.

Ahluwalia, I.J. (1991), *Productivity and Growth in Indian Manufacturing* (Oxford University Press: New Delhi).

Basu, K. (2006), ‘Gender and Say: A Model of Household Decision-making with Endogenous Power’, *The Economic Journal*, 116(511): 558–80.

Basu, K. (2010), The Economics of Foodgrain Management in India, Working Paper No.2/2010-DEA, Economic Division, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Basu, K. (2010a), *Beyond the Invisible Hand: Groundwork for a New Economics* (Princeton University Press: Princeton).

Besley, T. and Burgess, R. (2004), 'Can Labour Regulation Hinder Economic Performance? Evidence from India', *Quarterly Journal of Economics*, 119(1): 91–134.

Desai, S. and Jain, D. (1994), 'Maternal Employment and Family Dynamics: The Social Context of Women's Work in Rural South India', *Population and Development Review*, 20(1): 115–36.

Khera, R. (2010), 'India's Public Distribution System: Utilization and Impact', *Journal of Development Studies*, forthcoming.

Papola, T.S. (1994), 'Structural Adjustment, Labour Market Flexibility and Employment', *Indian Journal of Labour Economics*, 37(1): 3–16.

Sen, A. (1990), 'Gender and Cooperative Conflict', in I. Tinker (ed.), *Persistent Inequalities* (Oxford University Press: New York), pp123-49.

Shukla, R. (2010), How India Earns, Spends and Saves: Unmasking the Real India, NCAER-CMCR/Sage Publications, New Delhi.